দৈনিক
ইত্তেফাক

19 OCT 2017

শিক্ষা ব্যবস্থায় নবযুগের সূচনা কবে হবে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপ কমানোর স্বার্থে ঢাকা শহরের বৃহৎ সাতটি কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ফল হয় হিতে বিপরীত! দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার দরুন আজ প্রায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পতিত হয়েছে

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'—এ কথাটি মানতে আজ অনেকেই নারাজ। কারণ আমাদের চোখের সামনেই আমরা যখন দেখি আমাদের শিক্ষিত মানুষগুলোকে নানা অপকর্ম, ঘুষ, দুর্নীতি, এমনকি বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে, তখন আসলে সত্যি আমরা শিক্ষার কোনো উপযুক্ত সংজ্ঞা খুঁজে পাই না। তাই আজ অনেকেই অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলে থাকেন—'শিক্ষা নয় সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'।

এবার দেখবো, আমাদের দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা।

প্রাথমিক স্তর: এ স্তরের শিক্ষা একজন শিশুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটিই হচ্ছে ভিত্তি স্তর। আর এস্তরই যদি ভালো না হয় তাহলে একজন শিশুর আগামীর পথচলা কিছুতেই মসৃণ হবে না। এ স্তরে একজন শিশুর প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো তার 'পরিবার'। পরিবার থেকেই একজন শিশুর শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়। স্বাভাবিক আচার-আচরণ, ভালো-মন্দের জ্ঞান শিশু পরিবার থেকেই অর্জন করে থাকে। যে শিক্ষা তার পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এ গোড়াতেই যে থাকে গলদ। যেমন: একজন শিশু ভালো পরিবারে জন্ম নিচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে না ভালো নৈতিক শিক্ষা। ফলস্বরূপ, তারা খুব সহজে ধ্বংসাত্মক দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই এ স্তরে শিশুর সঠিক বিকাশে প্রতিটি পরিবারের অভিভাবকদের সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ স্তরে শিশুর দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'প্রাথমিক বিদ্যালয়'। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হবে শিশুর চিন্তা ও সৃজনশীলতার জগৎকে একে একে তাদের সামনে উপস্থাপন করা। যেমন: বর্ণ পরিচয় থেকে আরম্ভ করে রং চেনা, ফুল-ফল-পশু-পাখি থেকে গাছ, নদী, মানুষের বৈচিত্র্য, ছড়া, গল্প, খেলাধুলা, গান-নৃত্য-এগুলোর মধ্য দিয়ে শিশুর মনোজগৎ বিকশিত করা। ক্রমান্বয়ে সাহিত্য, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল হওয়া উচিত তার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বিষয়। যে শিক্ষা তার পরবর্তী জীবনের উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি হবে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থী কোনোভাবেই একজন শিক্ষার্থী থাকতে পারছে না, তাকে রূপান্তর করা হচ্ছে লাভজনক এক পণ্যে।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা চালু এবং সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণকে নিজেদের বড় এক সাফল্য হিসেবে প্রচার করে। কিন্তু এসব বই বাস্তবে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় কতটা ব্যবহৃত হয়, সে ব্যাপারে তারা কি কোনো খোঁজ-খবর রাখেন? শিক্ষার্থীদের এসব বই পড়ার সুযোগ এখন খুব কমই হয়। কারণ তাদের পড়তে হয় পয়সা দিয়ে কেনা মোটা গাইড বই। সৃজনশীল, কাঠামোবোধক এবং অন্যান্য নতুন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার আড়ালে বাড়ানো হয়েছে সিলেবাস, বেড়েছে পরীক্ষা, আর সেই সঙ্গে বেড়েছে কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য। স্কুলের মোটা মোটা গাইড বইয়ের বোঝা টানা, স্কুলের ক্লাস ও তৎসঙ্গে বাধ্যতামূলক কোচিং, কোচিং সেন্টার এবং টিউটর - এদের চাপে আজ বড়ই ক্লান্ত আমাদের কোমলমতি সন্তানেরা। তাই তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী বড়ই পরিতাপ করে বলেছিলেন, "সারাদিন 'পড় পড়' কারো ভালো লাগে না"।

তারপরও কেন যেন কোন অজ্ঞাত কারণে তিনিও আমাদের এ ভয়ঙ্কর শিক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদীনের জাদুর প্রদীপের ন্যায় বদলে দিতে পারছেন না!

মাধ্যমিক স্তর: এ স্তরে কোনোক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি পার হতে না হতেই অষ্টম শ্রেণিতে আবার আসে 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি)' নামক নতুন এক সনদ প্রাপ্তির যুদ্ধ। ধরা পড়ে একজন ছাত্রের আবার সেই চিরচেনা রূপটি। মোটা মোটা নোট-গাইড নিয়ে আবার কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিচারের কাছে দৌড়-ঝাঁপ। অবশ্য সম্প্রতি আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং, প্রাইভেট ও সব ধরনের নোট-গাইড, অনুশীলন বা সহায়ক বই নিষিদ্ধ করে শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। যে আইনটি এখন মন্ত্রিসভায় পাসের অপেক্ষায়। কিন্তু এ আইন আদৌ কি আলোর মুখ দেখবে?

জেএসসি যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই এ পর্যায়ের দ্বিতীয় যুদ্ধ 'মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি)' ছাত্রের দরজায় কড়া নাড়ে। ১৪টি বিষয়ের বিশাল এক সিলেবাস থাকে এ পর্যায়ে। অবশ্য কিছুদিন আগে ক্যারিয়ার শিক্ষা এবং শারীরিক শিক্ষা নামক দুটি বিষয়কে বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে অবশ্য আমাদের শিক্ষার্থীরা তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ এ দুটি বিষয় তাদের মহামূল্যবান জিপিএ-তে ব্যাপক ভূমিকা রাখতো। যেখানে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে ৭টি বিষয় দিয়ে তাদের মাধ্যমিক স্তর পার করে দেয়, সেখানে আমাদের শিক্ষার্থীদের পড়তে হয় তার দ্বিগুণ। এতে অবশ্য আমাদের শিক্ষার্থীদের আসল জ্ঞানার্জন কিছু হোক বা না হোক, বিলাসিতার কিন্তু কমতি নেই!

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর: এ পর্যায়ের শুরুতে মাধ্যমিকের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা অধিদপ্তর নির্ধারণ করে দেন একজন ছাত্রের ভর্তিযোগ্য কলেজ। ফলে প্রথম ধাক্কাতেই প্রকৃত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একজন মেধাবী ছাত্র বঞ্চিত হয় তার পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে। তারপর শিক্ষার্থীর আবার শুরু হয় কৃত্রিম ব্যস্ততা। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শাখার শিক্ষার্থীদের ব্যস্ততা আরো বেশি। অনেক কলেজেই হয় নামমাত্র ক্লাস। ফলে সেসকল কলেজে অধ্যয়নরত ভালো শিক্ষার্থীদের তাদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে অদম্য কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

এদিকে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বা তার আগেই শুরু হয় শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং সেন্টারে দৌড়-ঝাঁপ। এ দৌড়ে অবশ্য পিছিয়ে নেই আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীরাও। কারণ তারাও চায় তাদের লালিত স্বপ্নের বাস্তবতা, ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিক্যালে পড়তে। তাই কোনো বাবা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কিংবা কোনো মা তার শেষ সম্বল গরু বা ছাগলটি বিক্রি করে সন্তানকে পাঠিয়ে দেন শহরে কোচিং করতে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এ সকল বিদ্যার্থীর নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সহ্য করতে হয় অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। অনেক সময় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বলি হয়ে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীর মেডিক্যাল কিংবা ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।

উচ্চ শিক্ষার স্তর: অনেক স্বপ্ন নিয়েই এ স্তরে পা রাখেন আমাদের দেশের লাখো শিক্ষার্থী। কিন্তু এ পর্যায়ে কিছু দিন যেতেই তাদের রাতের ঘুম হারাম হওয়ার জোগাড় হয়। প্রথমত, চাকরির বাজারে ব্যাপক প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ব্যয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে ৩৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে বেশিরভাগ বিষয়গুলোতে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, এ সেমিস্টার পদ্ধতির গোঁজামিলে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সেশনজটের অভিশাপ দূরীভূত হলেও আটকে গেছে 'গভীর জ্ঞানার্জন'। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি সেমিস্টারে অনুষদভেদে ৫ থেকে ৭টি পর্যন্ত কোর্স পড়ানো হয়। প্রত্যেক বর্ষে থাকে চার মাসের তিনটি সেমিস্টার। ফলে সারাবছরই থাকে পরীক্ষার চাপ। প্রতি সেমিস্টারে থাকে চূড়ান্ত পরীক্ষা, একাধিক মিডটার্ম, টিউটোরিয়াল, প্রেজেন্টেশন, অ্যাসাইনমেন্ট, ল্যাব রিপোর্ট ও ভাইভা-এর দীর্ঘ আনুষ্ঠানিকতা। ফলে শিক্ষার্থীদের মূল ক্লাস এবং সিলেবাস যথারীতি শেষ করার সময়ই মিলছে না। তাহলে তাদের একটু মুক্তচিন্তা বা প্রকৃত জ্ঞান চর্চার মহামূল্যবান সময় কখন হবে? তাই শিক্ষার এ উচ্চ স্তরে এসে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার শর্টকাট মাধ্যম হিসেবে নোট-শিটকেই বেছে নিচ্ছে, ফলে তাদের জ্ঞান হয়ে পড়ছে সীমাবদ্ধ। তারা জানার ও শেখার আগ্রহ নিয়ে জ্ঞানচর্চা থেকে সরে আসছে, যা আমাদের জাতির জন্য এক ভয়াবহ হুমকি।

সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপ কমানোর স্বার্থে ঢাকা শহরের বৃহৎ সাতটি কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ফল হয় হিতে বিপরীত! দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার দরুন আজ প্রায় দেড় লক্ষাধিক উচ্চশিক্ষিত বিদ্যার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পতিত হয়েছে। তাই সরকারকে অবশ্যই আন্তরিক হয়ে এ অসহায় শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে হবে, যেন সিদ্দিকুর রহমানের মত আর কোনো উচ্চশিক্ষিত যুবক অকালে তাঁর দৃষ্টিশক্তি না হারান।

তাই আসছে শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই সরকারকে শিক্ষা ব্যবস্থার এ ঘনীভূত কালো আঁধার দূরীভূত করে, এক নবযুগের শুভ সূচনা করতে হবে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করবো, শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে নতুন 'শিক্ষা কমিশন' গঠন করুন এবং সে কমিশনে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। সনদসর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে 'শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রবর্তন করুন। তন্মধ্যেই সমগ্র শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণ নিহিত।

● **লেখক : শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ**